



Original Research

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী: সামাজিক মালিকানার রাষ্ট্রচিন্তা

মনির হোসেন

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

* Corresponding Author: Monir Hossain; Mobile: 01516502927; E-mail: monir@ban.brur.ac.bd

Received: 09/06/2026; Accepted: 10/08/2026; Online Available: 22/10/2026.

Abstract

Dr. Zafrullah Chowdhury (1941-2023) was a decent, unassuming and people-oriented person. At the center of his thoughts and actions was the desire to establish a society free from exploitation, rights of the common man, social dignity, equality and direct proximity to left politics in his adolescence and youth provided intellectual inspiration to his philosophy of the state. In particular, the questions of social ownership of wealth, reduction of economic inequality, rights of workers and farmers, use of state resources for public welfare and empowerment of the people became important in his thoughts. He believed that achieving real freedom of the people cannot be ensured only by achieving political freedom. If the wealth and production system of the state are under the control of a limited number of individuals or groups, then the common man remains economically and socially subjugated. This view brings him closer to the concept of equality and social justice of leftist politics. However, his leftist politics was characterized by the fact that it was not bound by any strict ideological framework; rather, it was developed around the questions of people's real life, health, education, employment and social security. He strongly hated hypocrisy and those without ideals. Later, by establishing the Gonoshasthaya Kendra, he set an important example of the practical application of his political and social philosophy. Affordable healthcare for the common people, need-based treatment and the creation of participatory institutions for the people manifested a benevolent form in his work. For him, the state was an institution of service to the people, not a tool for the powerful to use their power and protect their own interests.

Keywords— *Inconspicuous, Privatization, hypocrisy, Gono-project, Social-ownership.*

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে জন-নন্দিত প্রখ্যাত জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, মুক্তিযোদ্ধা, গণ-সংগঠক ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (২৭ ডিসেম্বর ১৯৪১-১১ এপ্রিল ২০২৩) কালোত্তীর্ণ এক অনন্য, অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নির্মোহ, নির্লোভ, আদর্শবাদী ও প্রগতিশীল এই মানুষটি আমৃত্যু শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনামুক্ত একটি মানবিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে গিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সামাজিক মালিকানা, জন-অংশগ্রহণ ও গণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব। এ লক্ষ্যে তিনি যেমন গণস্বাস্থ্যভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ-সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন; তেমনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামেও ছিলেন সদা সক্রিয় ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী কখনোই বুর্জোয়া কিংবা কর্পোরেট পুঁজিবাদী রাজনৈতিক শক্তির কাছে নিজের আদর্শকে সমর্পণ করেননি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের জাতীয় ঔষধনীতি প্রণয়ন, স্বাস্থ্যখাতের বাণিজ্যিকীকরণ বিরোধী অবস্থানে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা দেশের স্বাস্থ্যখাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। একই সঙ্গে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের ভোটাধিকার, বাকস্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সামাজিক নিরাপত্তা, সুবিচার ও মৌলিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনেও তিনি ছিলেন আপসহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। জাতির সংকটময় মুহূর্তে তাঁর সাহসী উপস্থিতি মুক্তিকামী মানুষের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ও গণমুখী উদ্যোগসমূহ মূলত মেহনতি, প্রান্তিক ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ, সামাজিক মর্যাদা, সাম্য, ন্যায়বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্যে নির্মিত। যা তাঁর রাষ্ট্র-দর্শনের প্রতিফলন। এই রাষ্ট্র-দর্শন আবার পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদী নয়, বরং গঙ্গারিডাই-মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে গড়ে ওঠা বঙ্গীয় জনপদে বসবাসকৃত গণমানুষের হাজার বছর ধরে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির ঐতিহ্য নির্ভর লড়াই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যে জীবনবাদী সমন্বয়নির্ভর গণতান্ত্রিক দর্শনের বিকাশ হয়েছিল; তার সাথে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর আত্ম-মননে লালিত মার্কসীয় অর্থনৈতিক ধারা “সামাজিক মালিকানা” তত্ত্বটি বঙ্গীয় মূল্যবোধের সাথে তিনি মিশ্রিত করেছেন। তাঁর এ রাষ্ট্র-দর্শন জীবনবাদী, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আবহে সামাজিক মালিকানার। এ গবেষণা প্রবন্ধে “ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সামাজিক মালিকানার রাষ্ট্রচিন্তা” দিকটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উদঘাটন করা হয়েছে।

মূল-শব্দ: জীবনবাদী, গণতন্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার বাণিজ্যিকীকরণ, সমাজতন্ত্র, মাওবাদ, ব্যক্তি মালিকানা, গণ-মডেল প্রকল্প, সামাজিক মালিকানা।

ভূমিকা

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (১৯৪১-২০২৩) বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক, মুক্তিযোদ্ধা, গণ-সংগঠক, জনস্বাস্থ্যবিদ, রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তক। নির্লোভ ও প্রগতিবাদী এই চিকিৎসক স্বাস্থ্যখাতকে কেবল ব্যক্তিগত আয়-উপার্জনের মুনাফার খাত হিসেবে দেখেননি; বরং শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবাকে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মময় জগতের কেন্দ্রে ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মেহনতি দরিদ্র, শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনায় নাগরিকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। তিনি কখনো ভীত হোননি, তোষামোদ করেননি। কারো চোখ রাঙানি তাঁকে দমাতে পারেনি। রাষ্ট্রে মেহনতি, নিপীড়িত, নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মৌলিক অধিকার পক্ষে; সত্য ও ন্যায়সঙ্গত প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থান ছিল দৃঢ়।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পাশ্চাত্য দর্শনের স্কুলের উপর নির্ভরশীল। অথচ এদেশীয় জনগণ ও তাঁদের ঐতিহ্যনির্ভর হাজার বছরের লড়াই সংগ্রামের সহজাত ঔদার্যবোধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নমনীয়তা, সমন্বয় ও জীবনবাদী প্রবণতায় আমাদের রাষ্ট্র-দর্শনের নীতি গড়ে ওঠেনি। জনসংস্কৃতি ও জন-আকাঙ্ক্ষা বিচ্ছিন্ন এসব পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের স্কুল স্বাধীনতার পাঁচদশক পরেও আমাদের সমাজজীবনে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ নাগরিকরূপে যেমন গড়ে তুলতে পারেনি; তেমনি প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের সাথে এক ধরনের রাষ্ট্রিক গণ-বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত। বাঙালি চিরন্তন জীবনবাদী। সে কেবলই নিজে বাঁচতে চায় না, আশেপাশের সব প্রাণ-প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে বাঁচতে চায়। এ সমন্বয়বাদী প্রবণতাই পাশ্চাত্য দর্শন থেকে আমাদের পৃথক করেছে। বাঙালি চলার পথে সবকিছুকে সঙ্গে নিয়েছে কিন্তু চাহিদা পূরণে ব্যর্থ, বিকশিত পথে বাঁধাপ্রাপ্ত মনে করলে বাঙালি তা বাতলে নিজের রাস্তার বাঁক-বদল করেছে। নানাবিধ মিশ্রণ ও সংমিশ্রণে আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থাকলেও পাশ্চাত্য মতো প্রবল নয়। সমন্বয়বাদী সমাজসত্তার মধ্যেই বাঙালি ব্যক্তিসত্তা বিকাশের মাতৃভূমি খোঁজেছে। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এই সমন্বয়বাদী ধারার উত্তরাধিকারী ব্যক্তিত্ব। এই গবেষণা প্রবন্ধ ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর রাষ্ট্রদর্শনকে একটি সুসংবদ্ধ একাডেমিক কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করা হবে এবং বাংলাদেশের বিকল্প উন্নয়ন ও সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ভাবনা নিয়ে গবেষণায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করবে।

গবেষণা-শূন্যতা

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে নিয়ে বাংলাদেশে আলোচনা প্রধানত মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা, গণস্বাস্থ্য আন্দোলন, স্বাস্থ্যনীতি, ওষুধনীতি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য ও সমাজসংস্কারমূলক অবদানকে যথার্থভাবে তুলে ধরলেও তাঁর “রাষ্ট্রচিন্তা-ভাবনা” তুলনামূলকভাবে খুবই কম আলোচিত হয়েছে। তাঁর জীবনদর্শন ও কর্মকাণ্ডে বিশেষত অর্জিত সম্পদ সামাজিক মালিকানায় দান করা; গণ-মডেল প্রকল্প, রাষ্ট্রের ভূমিকা, জনগণের ক্ষমতায়ন, বামপন্থা রাজনীতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সামাজিক অধিকার, অর্থনৈতিক সমতা, প্রান্তিক জনগণের অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র-নাগরিক সম্পর্ক এই বিষয়গুলোকে তাঁর সামগ্রিক রাষ্ট্রচিন্তার পরিসরের মধ্যে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করার রিসার্চ শূন্যতা রয়েছে। জাফরুল্লাহ চৌধুরী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে পুনর্গঠনের কথা ভেবেছেন- এ ধরনের রাষ্ট্র মডেল আসলে কী ধরনের? সর্বোপরি, “সামাজিক মালিকানা ও জনগণকেন্দ্রিক উন্নয়ন-ভাবনা” কেন্দ্র করে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর রাষ্ট্রদর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করাই এ প্রবন্ধে গবেষণা শূন্যতা পূরণের মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

‘ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী: সামাজিক মালিকানার রাষ্ট্রচিন্তা’ শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। গবেষণার মূল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির সমন্বয় আছে। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার উপরে কোনোরকম একাডেমিক গবেষণা সম্পাদিত হয়নি; যার ফলে গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের উৎস ব্যবহারকল্পে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, বক্তৃতা, সভা-সেমিনার, বিবৃতি ও তাঁর চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত মার্কসীয় দর্শন, গণতন্ত্র প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক দলিল বিবেচ্য হয়েছে। আর মাধ্যমিক উৎস হিসেবে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, গণস্বাস্থ্য মডেল এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও জনস্বাস্থ্যবিষয়ক প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং তাঁকে

নিজে জাতীয় মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতে প্রচারিত দেশের বিভিন্ন স্তরের, মতের ব্যক্তিবর্গদের মূল্যায়ন ‘সামাজিক মালিকানার রাষ্ট্রচিন্তা’র দর্শন নির্ণয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.

বীর মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক ও জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ১৯৪১ সালের ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী কোয়েপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা হুমায়ুন মোর্শেদ চৌধুরী ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা; যিনি ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেন এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। মা হাছিনা বেগম চৌধুরী ছিলেন গৃহিণী। মা-বাবার দশ সন্তানের মধ্যে জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন অগ্রজ। তাঁর ডাক নাম ছিল কচি। পিতার চাকরিসূত্রে জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে বিভিন্ন জায়গায় শৈশব অতিবাহিত করতে হয়েছে। ফলে তাঁর মননসত্তা গড়ে ওঠেছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে। এ সমন্বয়বাদী বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সব মত, পথ, দর্শন ও চিন্তাধারার মধ্যে ভবিষ্যতে নিজেকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় করে তুলতে মূখ্য ভূমিকা রেখেছিল। তবে শৈশবের একটি অংশ তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন। কলকাতায় ১৯৪৮-৪৯ সালে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু হলেও পরে বাবার চাকরি বদলি হলে ঢাকার বকশীবাজারের নবকুমার স্কুল থেকে ১৯৫৬ সালে মাধ্যমিক (ম্যাট্রিক) শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট (১৯৫৯) এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস (১৯৬৪) অধ্যয়ন করেন। সেই সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়ন তথা বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাচিত হোন। একদা হাসপাতালের অনিয়ম, দুর্নীতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে আলোচিত হয়ে ওঠেন। তিনি যখন সক্রিয় বাম রাজনীতিতে সম্পৃক্ত তখন ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত-চীন মতাদর্শিক মহাবিতর্কে উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও প্রভাব পড়ে। মূল পার্টি ছাড়াও কৃষকদের গণসংগঠন, শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠনগুলো দ্বিধা তিক্ততায় মস্কোপন্থী-চীনাপন্থী নামে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এসব বিভক্তি দেখে ত্যাগ করেছিলেন রাজনীতি। আমৃত্যু তিনি কোনো পার্টিগত রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হোননি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন:

আমি নিজেকে এখনো সমাজতন্ত্রী ভাবি। ছোটবেলায় আমি এক অসাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে বড় হয়েছি। মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আমার পৈতৃক ও মাতুলালয় ঘিরে সহাবস্থান করছেন। আমার বাবা পালি অধ্যয়ন করেছেন। বাবার শিক্ষক ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেন, বাবা বিখ্যাত কবি নবীন চন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ব্রিটিশ যুগের বিপ্লবী দস্তিদার পরিবারের সদস্যরা আমাদের বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন [১]

অর্থাৎ উদারপন্থী পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছেন তিনি। ছাত্রাবস্থায় যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন তা যখন খণ্ড-বিখণ্ডে সংশোধনবাদী এবং ‘বামপন্থী সুবিধাবাদ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দৃষ্টিপাত না করে সংকীর্ণ উপায়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা আওড়িয়ে এবং অতিবিপ্লবী ধ্বনি তুলে জনগণকে’ [২] যারা ত্যাগ করেছিল তিনি তাঁদের কারো পক্ষেই থাকেননি। রাজনীতি জীবনের ইতি টেনে জাফরুল্লাহ চৌধুরী চলে যান বিলেতে উচ্চশিক্ষার জন্য। ১৯৬৭ সালে বিলেতের রয়্যাল কলেজ অব সার্জারি ও ভাসকুলার থেকে এফআরসিএস প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ইতিমধ্যে পূর্ব-বাংলায় স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হলে চূড়ান্ত পর্ব শেষ না করে লন্ডন ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। গেরিলা প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে ডা. এম এ মবিন ও জাফরুল্লাহ চৌধুরী আগরতলার মেলাঘরে ৪৮০ শয্যা বিশিষ্ট বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। যুদ্ধ শেষে এই হাসপাতালটিকেই তাঁরা প্রথমে কুমিল্লা ও পরে ঢাকায় স্থানান্তর করেন, যা আজ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (১৯৭২) হিসেবে পরিচিত। সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে গণ মডেল প্রকল্প আওতাধীন ১৯৯৮ সালের ১৪ জুলাই ঢাকার সাভারে প্রতিষ্ঠা করেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়। এ গণ-প্রকল্প সমূহ সম্পূর্ণ অলাভজনক এবং ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। পরিচালিত হয় ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ১৯৭৭-এ স্বাধীনতা পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে ফিলিপাইনের র্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার, ১৯৯২ সালে সুইডেন থেকে রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড, কানাডার ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব ন্যাচারাল মেডিসিন ২০০৯ সালে ডক্টর অব হিউম্যানিটেরিয়ান উপাধি, যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলি থেকে ২০১০ সালে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক হেলথ হিরোজ অ্যাওয়ার্ড, ১৯৭৪ সুইডিশ যুব শান্তি পুরস্কার, ২০০৯ মানবিক সেবায় ডক্টরেট (ডিএইচএস) বিশ্ব প্রাকৃতিক চিকিৎসা সংস্থা, টরন্টো, কানাডা; ২০২২ যুক্তরাজ্যের ‘ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশিস’ কর্তৃক প্রদত্ত ‘এনআরবি (অধিবাসী বাংলাদেশী) মুক্তিযুদ্ধ বীর ১৯৭১ পুরস্কার এবং সমাজসেবায় মরণোত্তর ২০২৬-স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। এছাড়া বার্ষিক্যজনিত রোগেও আক্রান্ত ছিলেন। নিয়মিত তাঁর ডায়ালাইসিস চলতো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেননি। হঠাৎ অসুস্থ হলে পড়লে ১০ই এপ্রিল, ২০২৩ সোমবার তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। পরেরদিন মঙ্গলবার ১১ এপ্রিল, ২০২৩

রাত সাড়ে ১১টার দিকে ৮২ বছর বয়সে রাজধানীর ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন। বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও গবেষক শিরীন হক ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্ত্রী এবং দুই সন্তানের মধ্যে রয়েছে ছেলে বারিশ চৌধুরী এবং মেয়ে বৃষ্টি চৌধুরী। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও দৃঢ়তার সাথে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন: ‘আমি সমাজতন্ত্রী। ব্যক্তিগত সম্পদে বিশ্বাস করি না।’[৩] অর্থাৎ তাঁর এই দৃঢ় চেতনার মূলে যৌবনে তিনি সাহচর্য পেয়েছিলেন জননেতা মাওলানা ভাসানীর। এমনকি স্বাধীন-উত্তর ‘কমরেড সিরাজ সিকদার, সর্বহারা পার্টি ও চীনপন্থী দলগুলো সাভার, মানিকগঞ্জ, পাবনা, যশোর, নরসিংদী অঞ্চলে পার্টির কার্যক্রম পরিচালনা করতে তাঁর সাহায্য সহযোগিতা পেতো। বিভিন্ন তথ্য ও তাঁর কার্যক্রম বিশ্লেষণে তাঁর গণ-সংগঠনের ধারণা মাওসেতুং এর সামাজিক আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।’[৪] ফলে রাজনৈতিক বিশ্লেষণে তাঁকে মাওবাদ সমর্থিত গণ-সংগঠক হিসেবে অভিহিত করা যায়। প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন-

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী সমাজবিপ্লবী ছিলেন। তিনি শুধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নয়, মানুষের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। জাফরুল্লাহ চৌধুরী আদ্যোপান্ত একজন বাংলাদেশি ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা করে গেছেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জনগণকে সম্পৃক্ত করেছেন [৫]

২.

৪৭’র দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারত বিভাজনে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে জন্ম হয় পাকিস্তানের। ‘মুসলমানরা প্রত্যাশা করেছিল দ্রব্যমূল্যের দাম নেমে আসবে।’[৬] ঘুচবে দুঃখ, নির্মূল হবে নিপীড়নের। শান্তিরাজ্য স্থাপন হবে। কিন্তু তা হয়নি। হিন্দু-মুসলমান দেশান্তরিতে সীমানা বদল হয়েছে; কিন্তু মানুষের জীবন-মানের পরিবর্তন হয়নি। বরং পুরনো পদ্ধতিতে শোষণের বন্দোবস্ত, রাজনৈতিক অস্থিরতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রকে করেছে অপাংক্তেয়। ঔপনিবেশ বিদায় নিলেও সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি শোষণের সাথে দেশীয় বুর্জোয়াদের কবলে পূর্ব-পাকিস্তান, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধু আক্রান্ত হয়েছে ভিন্ন-আঙ্গিকে। আবারও স্বাধীকার অর্জনের নানাবিধ দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে ৫২’র ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাঙালি “জাতীয়তাবাদ চেতনা” বিকাশের পথ ধরে ৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়েই জন্ম লাভ করে বাংলাদেশ। বিশেষত যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নিরিখে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল প্রারম্ভেই সে উদ্দেশ্যও থুবেড়ে পড়ে। যুদ্ধবিক্ষত দেশে দুর্ভিক্ষ, পরাজিত শক্তির আফালন, গণতন্ত্রকে হত্যা করে একদলীয় শাসন তথা বাকশাল কায়ম, রাজনৈতিক গুম, হত্যাকাণ্ড, বিরোধী মত দমন, ট্যাগিং দিয়ে বিশেষত বামমতাদর্শী মুক্তিযোদ্ধা ও তরণদের ক্রসফায়ার, জাসদের উত্থান প্রভৃতি স্বাধীনতা-উত্তর অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিকাশে অচলায়তন অবস্থা তৈরি হয়। তাছাড়া সদ্য-স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন আদর্শকে গ্রহণ করবে তা নিয়ে একপ্রকার ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছিল। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানে একইসাথে এমন চার ধরনের মূলনীতি গ্রহণ তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় তৈরি করেছে সংকট। সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক আ ফ ম মাহবুবুল হক প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন:

আওয়ামী লীগ শ্রেণিগত দার্শনিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সমাজতন্ত্রী, এমনকি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনও ছিল না। বাঙালি উঠতি-বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের স্বার্থ রক্ষাকারী সংগঠন হিসেবেই আওয়ামী লীগের উৎপত্তি ও বিকাশ। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন রব-সিরাজ গ্রুপ ‘স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার ধারায় শ্রমিক-কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিটি তাঁদের কাছে স্বচ্ছ ছিল না। এঁরা বাস্তব সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় প্রথমে র‍্যাডিক্যাল পেটিবুর্জোয়া চিন্তাধারা ও পরবর্তীতে ধাপে ধাপে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী তথা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ধারায় পরিবর্তিত ও তৎপরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনা দ্বারা সাধারণভাবে প্রভাবিত হলেও দার্শনিক, রাজনৈতিক, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিকতাকে সবক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত হতে পারেনি [৭]

অর্থাৎ, যে বৈষম্য রোধ ও সাম্যের আকাঙ্ক্ষায় একদা পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল; এবং তারপর হয়েছে বাংলাদেশ সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন কিংবা প্রতিফলন এ দুই রাষ্ট্রের প্রান্তিক মানুষের জন্য আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা, রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবায়ন হয়নি। বরঞ্চ ৮০’র দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যোগদানের বদলে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের কবলে পতিত হয়েছে দেশ। ধনী আরও ধনী হয়েছে। মেহনতি কৃষক, গরিব, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তের অবস্থান পরিবর্তন হয়নি। উৎপাদনের পদ্ধতির রূপান্তর ঘটেছে ঠিকই, তাতে শ্রম বেড়েছে, বেড়েছে কর্মঘণ্টা বিপরীতে বৈষম্যমূলক বৃত্তে মানুষের সংখ্যা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ জনপদ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে নগরনাট্য বিস্তৃত হয়েছে। হয়নি মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। বস্তুত, ধর্মীয় বিভাজনে একদা পাকিস্তান এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও প্রগতিপন্থা নামাঙ্কণে কোনো রাজনৈতিক দলই এদেশের মেহনতি মানুষ ও

সমাজবিকাশের স্তর অনুধাবন করতে পারেনি। যে বাম রাজনীতি'র নির্মোহ আদর্শে এককালে তরুণরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল; নিজেদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য, দলে-উপদলে বিভক্তি তাদের লক্ষ্যচ্যুত করেছে। পাকিস্তান ধনী বাইশ পরিবারের বদৌলতে আজ বাংলাদেশে ধনী সংখ্যা বেড়েছে বাইশ হাজারে। গণতন্ত্র শেকল বন্দী হয়েছে সংবিধান রক্ষার নামে। সামরিক ক্যান্টনমেন্টের বুটে পদদলিত হয়েছে সামাজিক, মৌলিক, গণতান্ত্রিক ভোট-ভোতের অধিকার। বাহাত্তর পরবর্তী রাষ্ট্রযন্ত্র ও দেশ একদলীয় শাসন, সামরিক অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত শাসকের স্থলে সামরিক শাসকের অধীনস্থ হতে হয়েছে এদেশের মানুষকে। যদিও নব্বই দশকে গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার সূচনা ঘটেছিল তা পরবর্তী একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পুনরায় ফ্যাসিবাদী অধিকারের শাসনপীড়নের করায়ত্ত হয়ে পড়ে বাংলাদেশ। রাজনৈতিক এ অস্থিরতায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, হত্যাকাণ্ড, সমাজমূলে সামন্তীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি, নারীর ক্ষমতায়ন না থাকা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মজুর, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের প্রকৃতপক্ষে আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি হয়নি। দোদুল্যমান সমাজবাস্তবতায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ হয়েছে আরও নানাবিধ শোষণমূলক অবস্থার। এছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সার্বিকভাবে অসহিষ্ণু। স্বাধীনতা-উত্তর এই পরিবেশ উপরন্তু হ্রাস তো হয়নি বরঞ্চ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতাসীন দল এবং ক্ষমতাহীন দল ও বিরোধী মতের উপর রাজনৈতিক দমন-পীড়ন চালানোর স্বভাব এখানে স্বাভাবিক ব্যাপার। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বাংলাদেশের জন্য থেকে মৃত্যু আগ পর্যন্ত তা সচেতনভাবেই অবলোকন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী'র বলেছেন:

দেশ স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু মানুষ মুক্ত হয়নি। স্বৈরাচার বিদায় হয়নি; কখনও সে নির্বাচিত কখনও বা জবরদখলদারী, এইটুকুই বৈচিত্র্য। নব্বইয়ের অভ্যুত্থানে জনগণ ছিল। ঘটনার দিন সাধারণ মানুষজন আসতে পারি নি হয়তো; কিন্তু তারা যে আসবে স্বৈরশাসক সেটা জানত, সে জন্যই ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে নি, পদত্যাগ করেছে। শাসক গেছে, শাসন যায়নি এবং সেই শাসনে নিগৃহীত হচ্ছে ওই জনগণ। [৮]

অর্থাৎ দশকের পর দশক ধরে ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও প্রান্তিক জনগণের ক্ষমতায়ন হয়নি। নির্বাচনমুখী গণতন্ত্রে শাসক বদলেছে, শোষণ বদলায়নি। যোগ হয়েছে পুঁজিবাদী আত্মশাসন। সঙ্গে এসেছে সাম্রাজ্যবাদ। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র শেকড় গেঁথেছে দেশীয় আবহে। বুর্জোয়া, অ-বুর্জোয়া, জাতীয়তাবাদী মুখা-বরণে জনগণের উপর চলছে শোষণ। ঔপনিবেশিক শাসনের পুরনো বন্দোবস্ত, মাথাভারি শাসনযন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতায় পাওয়া শাসনযন্ত্রের উত্তরাধিকার সূত্রের আমলাতন্ত্র প্রতিনিয়ত মানুষকে তাদের সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা সাধারণ উপলব্ধি দিত যে, তারা (আমলা) শাসক আর আমরা শাসিত; স্বাধীনতা কিংবা গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও উপলব্ধির পরিবর্তন হয়নি। কমানো যায়নি লাল ফিতার দৌরাত্ম্য। বরং ফ্যাসিবাদ, একনায়কতন্ত্র, ভোটাধিকার হরণে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমলাতন্ত্র সহযোগিতা করে আসছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। সংকট রাজনৈতিক প্রশাসনকেও প্রভাবিত করে ফেলে, কারণ রাজনৈতিক দলগুলো দেশ পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। আর রাজনৈতিক ব্যক্তিরও যেহেতু দল আর সরকার আলাদা করতে পারেন না, ফলে সাংগঠনিক কাজ করতে গিয়ে দেশ পরিচালনার সময় কম ব্যয় করেন। এই ক্রমবর্ধমান বৈশিষ্ট্যের কারণেই রাষ্ট্র যখনই সংকটে পতিত হয় এ আমলাতন্ত্র তাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিভাবকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত আদেশ রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন, বিচার ও অন্যান্য কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করে আছে। বিপরীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে প্রগতিপন্থার স্থানে প্রতিক্রিয়া, উগ্র দক্ষিণপন্থা, দ্রুত ও কার্যকরী উন্নয়নের বদলে দীর্ঘসূত্রিতায় পরিকল্পনার ব্যর্থতা, জনসাধারণের অধিকারের অস্বীকৃতি এবং গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামো অকার্যকর রাজনৈতিক দলগুলো “নির্বাচনমুখী জয়-পরাজয়” নামক অসুস্থতায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। স্বাধীনতা পরবর্তী মাওলানা ভাসানী লিখেছিলেন-‘আমলাতন্ত্র বলতেই যে প্রচলিত ও পরিচিত চেহারাটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অবাক হয়ে দেখলাম চীন সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। চীন বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সাফল্য আমলাতন্ত্রের কবল থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের মুক্তি সাধন।’ [৯] ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীও এ আমলাতান্ত্রিক গহ্বর থেকে মানুষকে মুক্ত করতে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে সরাসরি আহ্বান জানিয়েছেন। সমস্যার বৃত্ত নির্ণয়ে বিশ্লেষক ও গবেষক বদরুদ্দীন উমর মন্তব্য এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক:

আমাদের জনগণের এ দুর্দশা ও বঞ্চনার মূলে রয়েছে এ দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও তাদের দল। যখন যে শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় এসেছে কেউই ব্যবস্থাকে পাল্টাতে ভূমিকা নেয়নি বরং ব্যবস্থা টিকে রাখতে উদারনীতি ও সামঞ্জস্যময় বৈদেশিক নীতি মেনে চলেছে। ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে জনগণকে বেশি। এদেশে জাতীয়তাবাদের রাজনীতি প্রবণতার যে বিকাশ ঘটেছিল তাও ক্রমান্বয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে প্রসারিত হয়েছে। কেউ না হতে চাইলেও অন্য সমভাবাপন্ন আরেকজন উৎসাহ দিয়েছে। দল থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য দলে ঠাঁই নিয়েছে। দেশে চলমান শোষণ, শ্রেণিবৈষম্য, ধনী-গরিব বৈষম্য, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, খুন, গুম প্রভৃতির যে তীর্থক আটচল্লিশ বছরের দুর্বির্ঘট দুঃখ-যন্ত্রণা দেশীয় বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। এদের মূল সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্যবাদী

দেশ, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থ সংস্থাগুলোর চাপে গৃহীত হওয়ার কারণে কোনও কিছুই এদের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ নেই। কাজেই এদের সব সিদ্ধান্তের মধ্যেই একটা অনিশ্চয়তা আছে এবং এদের কোনও নীতি বা কাজের পরিণতি কী দাঁড়াবে সে বিষয়েও এদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। শাসক শ্রেণি বলতে শুধু একটি বিশেষ দলকে বোঝায় না। আওয়ামী লীগসহ বুর্জোয়া শ্রেণির অন্য দলগুলোও একইভাবে এই শাসক শ্রেণির অন্তর্গত। [১০]

অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারাও প্রকৃত জাতীয়তাবাদী হতে পারেনি। যদি হতো তাহলেও জাতীয় পুঁজির বিকাশ হতো। বরঞ্চ জাতীয়তাবাদের ধ্বনি তুলে তাঁদের সহজাত সম্পর্ক স্থাপিত হয় সাম্রাজ্যবাদ কবলিত কর্পোরেট পুঁজি, কোম্পানি ও আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর সাথে। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়লে যে রাষ্ট্রীয় পুঁজি বিকাশের পথ প্রসারিত হয় এবং সেই পথে-প্রান্তরে জনগণের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়ে তাও বাংলাদেশে হয় না। সস্তা শ্রমের দেশে পুঁজি আসে, খাটে এবং পুঁজি ঘনীভূত হয়ে পুনরায় চলে যায়। মাঝখানে লাভবান হয় বুর্জোয়া শ্রেণি। অন্যদিকে এখানে জনগণকে ধর্মাত্মক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অশিক্ষিত করে শোষণমূলক সাংস্কৃতিক প্রকল্প জারি আছে। মাধ্যম ও গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে সমাজ ও রাষ্ট্রে কালচার হেজমিনি তৈরিপূর্বক পক্ষে সম্মতি উৎপাদন করে শোষণ ও বুর্জোয়াশ্রেণি এই কার্যক্রম পরিচালনা করে। আজ এ দল তো, পরশু আরেক দল। গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সর্বত্র ধর্মকে যাচ্ছে-তাইভাবে রাজনৈতিক ময়দানে ব্যবহার করে। অন্যদিকে বাম ও প্রগতিপন্থীরাও এ ঘোরপ্যাঁচের বাইরে আসতে পারছে না। নিজেদের মধ্যে আত্মকোন্দল, দ্বিধা-বিভক্তির কারণে জনগণের সাথে তাদের রয়েছে সাংস্কৃতিক গণ-বিচ্ছিন্নতা। গবেষক আহমদ রফিক তাঁর এক মন্তব্যে বলেছেন:

সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে পরস্পর-বিরোধী স্রোতের টানা পোড়নের ধারাবাহিকতা নিয়ে স্বাধীনতা-উত্তরকালের সংস্কৃতিচর্চা এখনো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বিভবান এলিট শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ। প্রগতিপন্থীদের হাতে তা বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও বিপরীত স্রোতের প্রভাব এখনো প্রবল। শাসক রাজনীতি সেই স্রোতের সংস্কৃতি চর্চার পক্ষে নীতিগত প্রভাব জুগিয়ে চলেছে। কারণ জাতীয়তাবাদী শাসকশ্রেণী স্বাধীনতা উত্তর প্রগতির রাজনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে চেষ্টা করে নি। তাই একদা আমলা-মুৎসুদি পুঁজির বদলে এখন আমরা সমর্থিত; কর্পোরেট পুঁজির অনেক বড়বাড়ত, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী বাজার অর্থনীতির সমর্থন নিয়ে। সেই সূত্রে অপসংস্কৃতি প্রকাশ ও বিস্তার, পণ্য সংস্কৃতির জয়জয়কার [১১]

অর্থাৎ সবকিছুই এখন পণ্য। মৌলিক অধিকার আইনে সম্মিলিত হলেও শিক্ষা থেকে চিকিৎসা, খাদ্য থেকে বিনোদন প্যাকেজ নির্ভর ব্যবসায়িক পণ্য। কোনোকিছু পণ্যে পরিগণিত না হলেও, বাজারমূল্য না থাকলে সামাজিক মূল্যায়নের কাতারে আসতে পারছে না। বিদ্যমান ব্যবস্থায় যারা উন্নয়নের ধ্বনি তুলে তারাও সর্বত্র শোষণে ব্যস্ত থেকে তাদের পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থাও সভ্যতার বিকাশকে দ্রুততম টেকসই করে তুলতে পারেনি। আবার গণতন্ত্রের বিস্তৃতির সময়কালে পুঁজিবাদকে সামাজিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে মদদপুষ্ট শহুরে কৃত্রিম বুদ্ধিজীবী। কর্পোরেট মিডিয়া তাদের বয়ান প্রচার করে, পুঁজি সুরক্ষায় স্ব-পক্ষে উৎপাদন করে সম্মতি। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণিই রাষ্ট্রের পলিসি বাস্তবায়নে গণতন্ত্রের নামে “সুশীল সমাজ” হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। মানুষের ন্যায্য, মানবিক, প্রাকৃতিক, জৈবিক অধিকারকে উপেক্ষা করে; ধর্ম বনাম প্রগতির দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু বনাম সংখ্যাগুরু প্রভৃতি বয়ানে, লেখনীতে বড় করে দেখায়। অন্তরালে রাষ্ট্রযন্ত্রকে চাপের মুখে রেখে পুঁজিবাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও মুনাফার বড় পাহারাদাররূপে আবির্ভূত হয়। তাই প্রতিনিয়ত যারা উন্নয়নের গাল-গল্পে মুখরিত ‘এইসব লোকজন নিজেদেরকে যা বলে দাবি করে এবং আদতে তারা যা, তার মধ্যে স্পষ্টতঃই তফাৎ রয়েছে।’ [১২] কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বের একটি বৈশ্বিক একক প্রবণতায় পুঁজিবাদ নিজে নিজেই মুনাফার স্বার্থে সংস্কার কর্ম অব্যাহত রাখে। এমতাবস্থায় বিশ্বায়নের যুগে সমাজতন্ত্র মতবাদকেও সংস্কার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী মূলত এই চিন্তার স্মারক। বাংলাদেশের প্রগতিপন্থী এক রাজনৈতিক দলের প্রচারিত প্রেসনোটে তারা বলতে চেয়েছেন :

মার্কিন নিয়ন্ত্রিত সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ইত্যাদি এবং দানদার বা তথাকথিত দাতা দেশগুলোর নির্দেশে গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি, শিল্প ও কৃষি নীতি আমাদেরকে ক্রমেই এক বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের শোষণ শ্রেণির সরকারগুলো গদির লোভে মার্কিন হুকুমদারির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে ভয় পায়। এত ঝগড়া এত ফ্যাসাদ, এত সংঘর্ষ এত আড়াআড়ি সত্ত্বেও বড় দলগুলো মার্কিনীদের মধ্যস্থতায় প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে মৌলিক অর্থ-সামাজিক নীতির প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতোদিন বাংলাদেশে প্রধানত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। বেশ কিছুকাল যাবত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও কার্ভার্ট অ্যাকশনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। বিশ্বব্যাপী মার্কিন আগ্রাসনের গুণগত পরিবর্তন বা উল্লঙ্ঘনের প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের গ্যাস, বিদ্যুৎ, বন্দর, টেলিফোন, মোবাইল সবকিছু গ্রাস করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয় মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রকে এই দেশে প্রলুব্ধ করছে সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান [১৩]

অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মানুষ শহরমুখী। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে, মফস্বল থেকে, প্রান্তিক পর্যায়ে থেকে স্বাঙ্গিক চোখে মানুষ এখন পাড়ি জমাচ্ছে বড় বড় সব শহরে-নগরে। গ্রামীণ সমাজ ছেড়ে যুক্ত হচ্ছে নাগরিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরি, কোম্পানির নানান কাজে। শহরের নামিদামি কোম্পানি, কল-কারখানায় এরা ব্যবহার হচ্ছে, বিক্রি করছে শ্রম। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনে হচ্ছে একে অপরের প্রতিযোগী। পুঁজিবাদী সুবিশাল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানায এক সুবিশাল অংশ শ্রম দিয়ে যাচ্ছে আর আরেক ক্ষুদ্র অংশ এ শ্রম আত্মসাৎ করে ধনীর চেয়ে আরে ধনী হচ্ছে। তাতে সমাজে, রাষ্ট্রে বাড়ছে বৈষম্য। খ্যাতিমান একজন সমাজ বিশ্লেষক লিখেছেন :

দেশীয় এ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, ধনতন্ত্রকে ধারণ করেই নিজেকে সৃজন করতে পথ খুঁজেছে; বাঁধা হিসেবে যাকে প্রধান শত্রু মনে করেছে তাকে সরাতে ওঠে পড়ে লেগেছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কুচক্রী মহলের সাথে। আর এ দেশীয় ধনীরা ক্ষমতায় যাবার সম্ভাবনা আছে এ জাতীয় দলকে চাঁদা দেয়। এসব চাঁদা আসে কালো টাকার মালিক চোরাকারবারীদের থেকে। এসব চোরাকারবারীগণ প্রয়োজনে বিরোধী দলের আশ্রয় পায় [১৪]

অর্থাৎ কেবলই আশ্রয় পায় না। জনগণের মত, জন-আকাজক্ষাকে উপেক্ষা করে দুর্বৃত্তদের আমন্ত্রণও জানানো হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ করতে গিয়ে গুলিবর্ষণে নিহত হয় সাধারণ মানুষ। পক্ষান্তরে কালো টাকা সাদা হয়। ব্যাংক লুটপাট হয় প্রকাশ্যে। দ্রব্য মূল্যের দামে মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে, চিকিৎসা আর শিক্ষা হয়ে ওঠেছে পণ্য। ভোটের মাঠে টাকার ছড়াছড়ি, ভোট ক্রয়-বিক্রয়, চোরাকারবারি, খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় অর্থ পাচারকারীরা নির্বিঘ্নে নিরাপত্তা পায়। নির্বাচনে জয়ী হতো সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় বুর্জোয়াদের অর্থের বরাদ্দ ও বিপদে নিরাপত্তা দেয়, পালাতে সাহায্য করে। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন ‘যখন নরেন্দ্র মোদি এসেছে তখন ছাত্ররা প্রতিবাদ করে ন্যায় কাজ করেছে। আটক ৫৪ জন ছাত্ররাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তারাই উন্নত ভবিষ্যৎ দেখাতে পারে।’ [১৫] অন্যত্র সাক্ষাৎকারে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে আরও মতামত প্রদানে করেছেন যে:

পরিবর্তন। আমাদের পরিবর্তন দরকার, যেন সবাই ভালো থাকি। জনকল্যাণকর বাংলাদেশ, যেটি পৃথিবীর আদর্শ হবে। আমরা পৃথিবীর সবার কাছে আদর্শ হবো। এখন তো পুঁজিপতিরা আমাদের পিঠ থাপড়ায়। আমাদের ভুল কাজে প্রবাহিত করে। আমাদের তা পরিবর্তন করতে হবে। তরুণরা সে পরিবর্তন আনবে [১৬]

অর্থাৎ পুরনো ধাঁচের রাজনৈতিক কাঠামো আর বন্দোবস্ত একবিংশ শতাব্দীতে এসে আর টিকছে না, ভবিষ্যতেও তা টিকবে না। বিমূর্ত সমাজসত্তা পরিবর্তনশীল। আরও দৃঢ়ভাবে বললে আদর্শভিত্তিক রাজনীতি যখন রাজনৈতিক দলের একক নেতৃত্বের ক্ষমতা, ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে চলে যায়, এক অর্থে তা ফ্যাসিবাদ তৈরি করে। রূপান্তর করে আদর্শিক মৌলবাদীতায়। কিন্তু মানুষের যে আদিম ক্ষুধা, প্রাকৃতিক ও মৌলিক চাহিদার আদর্শ তা চিরন্তন এবং গতিশীল। এ শতাব্দীতে তরুণ-তরুণীরা পূর্বের ন্যায় আরও বেশি উদ্যম ও ঝড়-ঝঞ্ঝা। ২০১১-এ তিউনিসিয়া, ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায়, ২০২৪ এ বাংলাদেশ ও ২৫-এ নেপালে তরুণরা যে গণ-অভ্যুত্থানের সূত্রপাত করেছে এর মূলে ছিল বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিতের উদ্দেশ্য। কোনো পার্টিগত আদর্শ এখানে কাজ করেনি। তীব্র বেকারত্ব, সামাজিক ন্যায়, সাম্য, সুবিচার ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থাৎ সামাজিক মালিকানা প্রাপ্তির অভাবই তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী তরুণদের এ অভাববোধ তাঁর সক্রিয় চিন্তা প্রসারতার সহিত সচেতনভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাষ্ট্র দর্শনে তিনি পরিবর্তন চেয়েছেন। বিদ্যমান কাঠামো ভেঙে, পুঁজিবাদের শোষণ, দুঃশাসন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, টাকার ছড়াছড়ির ভোট, সাম্প্রদায়িকতা নির্মূলে তিনি ছিলেন পরিবর্তনকামী, সংস্কারবাদী। পুরোনো প্র্যাকটিসে অভ্যস্ত প্রগতিশীলদের প্রতি তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। এ পরিবর্তনে ভরসার জায়গা-জমি তাঁর কাছে সাহসী প্রগতিপন্থী, সংস্কারকামী তরুণরা। যাদের রাস্তাটা ডানপন্থা বা দক্ষিণপন্থায় নয়; প্রগতিপন্থায়। শর্ত জুড়ে দেওয়া আছে এক; তা হলো এদেশীয় সমাজ-সংস্কৃতি-বিভিন্ন জাতি ও মূল্যবোধকে ধারণ করে এমন সব পরিবর্তনকামী প্রগতিশীল মানুষজনের প্রতি।

৩.

বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনেকগুলো দল থাকলেও আদর্শিকভাবে এখানে দুটি ধারার দল বিদ্যমান। একটি ধারা (আওয়ামী লীগ-বিএনপি- হেফাজত-জামাত-জাতীয় পার্টি ধর্মভিত্তিক দলগুলো) তথা পুঁজিবাদ সমর্থিত ধারার, অপরটি প্রগতিশীল অর্থাৎ কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বামপন্থী ধারার। যদিও ধারা দুইটি নতুন নয়, আগেও এরা ছিল দেশে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ নামে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নতুন নামে অনেকেই দল গঠন করেছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রিক কাঠামোতে সব দলই নতুন; পুরনো

কাঠামোর বৃত্তে। জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের অপ্রতুলতা, প্রকৃত শিক্ষার অভাবে গোঁড়ামি, সমাজ-পরিবারে সামন্তীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের লালন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অতীতের মোহে আচ্ছন্ন এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল ও প্রান্তিক মানুষরাও এখনো রাজনৈতিক বাস্তবতায় অবিকশিত, অজ্ঞ। যুক্তি বা মননশীলতা খুবই কম। ফলে রাজনৈতিক ময়দানে এখানে ডানপন্থী দলগুলোর শক্তি দৃশ্যমানভাবে অনেক বেশি। যদিও বামপন্থী দল আছে; তাঁদের গৌরবময় আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস আছে কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতাদর্শিক বিভ্রান্তি, দলে-উপদলে বিভক্তি, ঐক্যহীনতায় তাঁরা অনেক ভালো কথা বলার পরেও জনগণ তাঁদের পাশে থাকছে না। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শহুরে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন-সংগ্রাম মূল জনস্রোতমুখী থেকে আলাদা, যা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বিভিন্ন সভা-সেমিনারে এ রাজনীতি বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে প্রাবন্ধিক আহমদ হুফা লিখেছেন:

বাঙালি জনগণ যে আলাদা একটি জাতিসত্তা-এখানকার ডান-বাম কোন রাজনৈতিক দলের ঘোষণাতেই তার সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি মেলে না। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই বাঙালি জাতিসত্তা নিজেকে উন্মোচিত করেছে। মনীষা ও প্রজ্ঞার বলে সচেতন বুদ্ধি খাটিয়ে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির নিরিখে এই জাতিসত্তার অস্তিত্ব কেউ অবিকার করে নি। না কোন দল, না কোন নেতা। বাংলাদেশে বর্তমানে যে কঠিন সঙ্কটে নিপতিত, তাও মূলত জাতিসত্তা চিনতে না পারারই সঙ্কট [১৭]

অর্থাৎ কোনো জাতিগোষ্ঠীকে সুসংহত করতে সবার আগে তাঁর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অন্তঃসত্তা অস্তিত্ব উদঘাটন করতে হয়। যেখানে ঐ জাতির স্বভাব, বিচারবোধ, নীতিনৈতিকতার স্রোতবাহী ধারণা, আচার-আচরণের প্রোথিত মূল্যবোধ, লড়াই সংগ্রামের বিকাশের পথে সহজাত গণতান্ত্রিক চেতনার পথ সঠিক নির্ণয় না করতে পারলে বিদেশি আদর্শের মোড়কে কিংবা তত্ত্ব পুশইন করে কখনো ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। যেমনটা এদেশের জনগণকে কোনো রাজনৈতিক দল করতে পারেনি। তাই যেমন লোক, তেমনই রাষ্ট্র গড়ে ওঠেছে আমাদের। প্রতিফলনস্বরূপ বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজেও সর্বত্র সরকারি-বেসরকারি সেক্টরে দুর্নীতি, লুটপাট; জাতিগত ফ্যাসাদ, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, নিয়ম ভাঙ্গার সংস্কৃতি প্রাত্যহিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমাজ ভেঙে, গড়ার দায়িত্ব যাদের জাফরুল্লাহ চৌধুরী এসব বামপন্থীদের চিহ্নিত করেছেন জাতীয়তাবাদী চেয়ে বড় আন্তর্জাতিকতাবাদী ধ্যানমগ্নরূপে। এছাড়া পেটি-বুর্জোয়া চিন্তা-চেতনা, সুবিধাবাদ, মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসা নেতা, নেতৃত্ব এবং শ্রেণিগত মানসিক দৌরাভ্য ও সাংস্কৃতিক সংকট বাংলাদেশের প্রগতিপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম মৌলিক সমস্যা রূপে তিনি চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি, মধ্যবিত্ত, প্রগতিপন্থীরা যে মেহনতি শ্রেণির মুক্তির কথা বলেন আদতে ‘কেউ সাংস্কৃতিক সংকট থেকে মুক্ত নন। এবং যে জনসমষ্টির মুক্তির জন্য এঁরা সংগ্রামে নামেন তাদের জীবনযাপন ও সংস্কৃতি এঁদের নাগালের বাইরে।’ [১৮] ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর চিন্তায় এসব দিকসহ বাঙালির জীবনবাদীতায় সমন্বয়বাদী গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রবণতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, মূলধারার গণমাধ্যমে প্রদত্ত বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। তিনি বলেছেন:

আমার চাওয়া হচ্ছে জাতীয় ঐক্য, দুর্নীতি হ্রাস ও জনগণের প্রকৃত ভোটে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে যে বড়লোকের গণতন্ত্র, তা টিকবে না। মাথা উঁচু করতে হলে বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংস্কারে সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে। আর সামরিক বাহিনীর মতো পোশাক খাতসহ শ্রমিকদের রেশন দিতে হবে সামরিক বাহিনীর দরে। তাহলে আমাদের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে, যেখানে আমরা ভারত ও শ্রীলঙ্কার চেয়ে পিছিয়ে আছি। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক চাই। আবার একই সঙ্গে সতর্কতাও চাই। আমি বাস্তববাদী, দক্ষিণপন্থী সরকারগুলোকে দিয়ে আমি দেশের জন্য কিছু ভালো কাজ করিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি। বিটিভিতে একবার বলেছিলাম, সমাজতন্ত্রের আদর্শ ছাড়া কাটা খালে পানি আসবে না [১৯]

অর্থাৎ সমাজতন্ত্রই ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী’র নিকট সমন্বয়বাদী আদর্শের মূলসুঁপ। যার প্রতিফলন সামাজিক মালিকানা। কিন্তু রাষ্ট্রে বিদ্যমান পুঁজিবাদী শাসনযন্ত্রে পরিচালিত রাষ্ট্রে জনগণের সমস্যা ও দ্বন্দ্ব দিনদিন আরো প্রকট হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা বলা হলেও আসলে তা কেবলই পুঁজির ঘনীভূতকরণে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। অবশ্য একটা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের সাথে অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী বটে কিন্তু অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে মানুষের মানসিক ও নৈতিক উন্নয়ন কতটুকু হচ্ছে তাও বলা অবান্তর। উন্নয়ন হচ্ছে না- তা বলা অনুচিত কিন্তু ভোগ বা ফল পাচ্ছে সমাজের ক্ষুদ্র অংশ। যারা ধনী থেকে আরো ধনীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আর বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ, বিক্ষোভ ও মূল দ্বন্দ্বকে আড়াল করতে বারংবার ধর্মীয় অনুভূতি ও দক্ষিণপন্থাকে সামনে এনে সামাজিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। কালচারাল হেজিমনি তৈরি করে ফায়দা লুটে নৌয়া হচ্ছে। প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম চাহিদা, শিক্ষা, চিকিৎসায় অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রকটভাবে রাষ্ট্রে ও সামাজিকভাবে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বেড়ে চলেছে। অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের সার্বিক রাষ্ট্র কাঠামো নিয়ে লিখেছেন:

বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে পুঁজিবাদী উন্নয়নের অধিকরত ভয়াবহ রূপ এবং তার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সামরিক শাসন, দমন-পীড়ন-নির্যাতন চালাতে গিয়ে শাসকশ্রেণী নিজের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মকে আশ্রয় করে। পুঁজিবাদী উন্নয়নের কর্মসূচির বিকল্প হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম। ধর্ম এখানে বিশ্বাসের নয়, ব্যবহারের বস্তু। শাসকশ্রেণীর কাছে ধর্মের এরকম অপরিহার্যতা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে নানাভাবে আঘাত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে বলে এদের বাঁচিয়ে রাখা ও পরিপুষ্ট করা চরম বুর্জোয়া শাসকের জন্যও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের শ্রেণিতে ঘণ্য ঘাতক এবং তথাকথিত স্বাধীনতার ধারার প্রবক্তাদের ঐক্যের সূত্র এভাবেই শ্রেণিগত স্বার্থ থেকে উৎসারিত হয় [২০]

অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও তার সংস্কৃতি বাংলার সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ভঙ্গুর করেছে দিনদিন। কৃষি, পরিবহনখাতেও কর্পোরেট পুঁজি ঢুকে পড়েছে। জমি হারিয়ে কৃষক শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে দিনদিন। বড় শহরগুলোতে বৃদ্ধাশ্রম, পথশিশু, নামহীন-গোত্রহীন উদ্বাস্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। মূলত পুঁজিবাদ ব্যক্তি পুঁজি/টাকার অবাধ ভোগ মানুষের ভেতরকার সুপ্ত স্বার্থবাদকে উন্মোচন করে সমাজ-পরিবার থেকে জনবিচ্ছিন্ন করে তুলে এবং তুলছে। একই রক্তের, গোত্রের সম্পর্কগুলো আলগা করে একজনকে আরেকজনের ওপর বিদ্বেষাপন্ন ভয়ংকর রকমের শত্রু বানিয়ে সংঘাতের পথ উন্মুক্ত করেছে। বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারেও অবাধ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ব্যবসা সম্প্রসারণে শিক্ষা, চিকিৎসাখাত হতে পড়ছে প্যাকেজ নির্ভর সেবা। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও সমাজ বিশ্লেষক বদরুদ্দীন উমর প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন:

এ ধরনের সমাজে একাধিক শ্রেণি শাসক শোষণের ভূমিকায় অবস্থান করে, এখানে দেশীয় শোষণ শ্রেণি হিসেবে সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণি ও পুঁজিপতি শ্রেণি উভয়ই যৌথভাবে ব্যাপক কৃষক শ্রমিক মেহনতী জনগণের উপর নিজেদের শাসন শোষণ অব্যাহত রাখে। শুধু তাই নয়। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ অবস্থা বিশেষ পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে এই দুই মূল শোষণ শাসক শ্রেণিকে সাহায্য করে এবং তাদের যৌথ একনায়কত্বের উত্থাতের জন্য শ্রমিক কৃষক ও জনগণের অপরাপর অংশের সম্মিলিত সংগ্রামের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত নিজেদের শক্তিকে যথাসাধ্য প্রয়োগ করার জন্যে প্রস্তুত থাকে। কৃষিকার্যে যারা নিযুক্ত থাকেন তাঁরা ছোট বড়ো জমির মালিক অথবা বর্গাচাষী হিসেবে নিযুক্ত না থেকে কৃষি, শ্রমিক, মজুরী শ্রমিক হিসেবেই নিযুক্ত থাকেন। অর্থাৎ কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আর পুরাতন অর্থে কৃষক নয়- তাঁরা হলেন শ্রমিক [২১]

অর্থাৎ শোষণ-শ্রেণির যৌথ শোষণের ফলে গ্রাম থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ শহরে গিয়ে কেবল শ্রমজীবীতে পরিণত হচ্ছে শুধু তাই নয়; হাজার বছর ধরে এই বাংলায় বিভিন্ন শাসকের শাসনামলে ‘আদিতে নিঃস্ব নিরন্ন দুঃস্থ রংগ দরিদ্র আমজনতার অনু-আবাস-চিকিৎসা প্রয়োজনীয় মাপে-মাত্রায় যেমন তখন মেলেনি। এমনকি আজও মিলছে না।’ [২২] মানুষ জীবনের শেষপ্রান্তে সারাজীবনের অর্জিত আয়, সম্পদ বিক্রি করে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হচ্ছে। যে কৃষক ফসল উৎপাদন করে তিনি তার মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন না। কর্পোরেট কোম্পানি ঠিক করে দেয় কৃষকের ফসলের দাম কত হবে। চিকিৎসার সরঞ্জাম, ঔষধ আমদানিকারক কোম্পানি দাম ঠিক করেছে। হাসপাতালে গড়ে ওঠছে কিন্তু চিকিৎসা যে সেবা সে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠছে না। কখনো অনুমোদন আবার অনুমোদনহীন গড়ে ওঠছে বেসরকারি ক্লিনিক। মান বাছাইহীন এসব ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, বেসরকারি হাসপাতালে চলছে ভয়াবহ নৈরাজ্য। ভিটেমাটি বিক্রি করে স্বাস্থ্য সেবা নিতে গিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে মানুষ। ‘এ এক মহাবিপর্ষয় প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্যসৃষ্ট।’ [২৩] ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন:

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতি। এখানে ঔষধের দাম বৃদ্ধি ও চিকিৎসকের অবহেলায় মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি না হলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমবে না [২৪]

অর্থাৎ তিনি চিকিৎসা ও ঔষধের দাম সাধারণ মানুষের নাগালে আনতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন গণস্বাস্থ্য হাসপাতাল। রাষ্ট্রযন্ত্র ও কর্পোরেট পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্যের মধ্যেও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ন্যূনতম টাকা দিয়েও কিভাবে সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা, ঔষধ দৌড় গাঁড়ায় পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ও গণমুখী উদ্যোগসমূহ মূলত মেহনতি, প্রান্তিক ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ, সামাজিক মর্যাদা, সাম্য, ন্যায়বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্যে নির্মিত। যা তাঁর সামাজিক মালিকানা রাষ্ট্র-দর্শনেরই প্রতিফলন। এই রাষ্ট্র-দর্শন আবার পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদী নয়, বরং গঙ্গারিডাই-মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে গড়ে ওঠা বঙ্গীয় জনপদে বসবাসকৃত গণমানুষের হাজার বছর ধরে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির ঐতিহ্য নির্ভর লড়াই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যে জীবনবাদী সমন্বয়নির্ভর গণতান্ত্রিক দর্শনের বিকাশ হয়েছিল; তার সাথে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী’র আত্ম-মননে লালিত মার্কসীয় অর্থনৈতিক ধারা “সামাজিক মালিকানা” তত্ত্বটি বঙ্গীয় মূল্যবোধের সাথে তিনি মিশ্রিত করেছেন। তাঁর কল্পিত এ রাষ্ট্র-দর্শন জীবনবাদী, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আবহে সামাজিক মালিকানার। তাই বলে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী পুঁজির বিরোধী নন, বরং পুঁজিবাদ বিরোধী। কারণ তিনি জানতেন

অর্থনীতিই সমাজ-কাঠামোর মূলস্তম্ভ। এর উপরেই সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। তাই এই অর্থনীতি যদি সামাজিক মালিকানার হয় তাহলেই সাধারণ মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্য রোধ সম্ভব। তাই পুঁজিবাদ নয়, পুঁজির বিকাশ তিনি চান। কারণ তা না ঘটলে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য হবে না। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন সৃষ্টি হবে না। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী তাঁর জীবদ্দশায় ‘দৈশিক-ভাষিক-জাতিক-রাষ্ট্রিক জীবনেও একটা অভিন্ন সত্তাচেতনায় ঐক্য ও একত্ব অনুভব করেছেন যেন দৈশিক-ভাষিক-রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক জাতিচেতনা দানা বাঁধতে পারে।’^[২৫] বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রীয় পুঁজির বিকাশ হয়নি এমন উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও যে রাজনৈতিক দলের বাইরে গিয়ে, মস্তিষ্কত্ব গ্রহণ না করে “সামাজিক মালিকানার” প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যায় তিনি তাঁর উজ্জ্বলতম উদাহরণ। সাক্ষাৎকারে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন:

দেশের কল্যাণে জনগণের স্বার্থে আমি চিন্তা করতে ভালোবাসি। খোলা মনে আমার বক্তব্য প্রকাশ করি। আমি বিএনপি, সিপিবি, বাসদ খালেবুজ্জামান, মাহমুদুর রহমান মান্না, ড. কামাল হোসেন, আ স ম রব, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীরও শুভানুধ্যায়ী। আমি বিশ্বাস করি, দেশে একটি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সাহসী বিরোধী দল থাকা দরকার। আর জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন শুধু রাজনীতিকেরাই আনতে পারেন [২৬]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের ভোটাধিকার, বাকস্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সামাজিক নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনেও তিনি ছিলেন আপসহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। জাতির সংকটময় মুহূর্তে তাঁর সাহসী উপস্থিতি মুক্তিকামী মানুষের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। গণতন্ত্র, সুশাসন ও রাষ্ট্রসংস্কার, অর্থনীতি সংস্কার প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন। অতীতের গৌরবে গর্বিত ছিলেন কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হোননি। সময়ের চাহিদা, যুগের পরিবর্তিত আবেদনে তিনি নিজেকে ভেঙেছেন। রাষ্ট্র-সংস্কারে পুরনো প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে তিনি যুগোপযোগী সমাধানের তাগাদা দিয়েছিলেন সব-সময়। কারণ সমাজ সচেতন ও যুক্তিবোধে প্রবলভাবে বিশ্বাসী ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এ সত্যটুকু অনুধ্যান করেছিলেন যে, সমাজ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল সমাজে ঐতিহ্যকে পুনঃস্থাপন করতে গেলে দ্বন্দ্ব বাঁধবে। নিজেকে সময়ে সাথে সাথে খাপ খাওয়ানোর নামই মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও প্রগতিশীলতা। সেজন্য তিনি এনজিও, দাতা সংস্থাদের আর্থিক সহযোগিতাকে জনকল্যাণমুখী কিভাবে করা যায় সেও প্রস্তাবনা দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। অর্থাৎ তিনি লগ্নিপুঁজিকে কিভাবে সামাজিক মালিকানায় রূপান্তর করা যায় সেই চেষ্টাটাই করেছেন। “গ্রামীণ মডেল” উন্নয়নে তিনি বিশ্বাস করতেন। যার আওতায় মোট প্রকল্পের সংখ্যা ২২টি। সাভারস্থ কেন্দ্রে হয়েছে ১৪টির মতো প্রকল্প। এর মধ্যে রয়েছে সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাসিক গণস্বাস্থ্য, গণপ্রকাশনী, গণমুদ্রণ, গণপাঠশালা, গণকৃষি খামার, নারী কেন্দ্র, গণস্বাস্থ্য বেকারী, গণস্বাস্থ্য জুট প্লাস্টিক, গণপাদুকা, গণকাঠ কারখানা, গণপ্রচারণা ও গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যাল। এ-সব গুলোই অলাভজনক। গণ-মাধ্যমে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন-

গণস্বাস্থ্য একটি পাবলিক ট্রাস্ট। কোনো ব্যক্তি এর মালিক নন। সাধারণ গরীব মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এর লক্ষ্য। আমি এবং আমার যুদ্ধকালীন ফিল্ড হাসপাতালের বন্ধুরা মিলে আমাদের চিন্তা, উপলব্ধিকে বিকাশ ঘটানোর জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করি। এটা ছিল যুদ্ধকালীন ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট বাংলাদেশ হাসপাতালের অপর রূপ। আমাদের তখন লক্ষ্য ছিল, যুদ্ধ পরবর্তী জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো। আমি যুদ্ধের পর আর্মির সার্জন ছিলাম। অনেক যুদ্ধাহত আর্মিকে অস্ত্রপচার করেছি। দরিদ্র জনগণের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে জাতির ভাগ্য। এ জাতির বেঁচে থাকার সব মৌলিক উপাদানই এদেশে আছে। সুষ্ঠু বণ্টন হলে জাতির প্রতিটি লোকের মৌলিক চাহিদা মিটেবে। যদিও বিলাস জীবন-যাপন হবে না। তবে গৌরব নিয়ে বাঁচা যাবে। অনেকে বলে বাঙালী কর্মবিমুখ। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের জনগণ কর্মবিমুখ নয়, বরং বলা যেতে পারে তাদের কাজের অভাব রয়েছে [২৭]

অর্থাৎ তাঁর রাষ্ট্র-দর্শনের কাছে মৌলিক অধিকার কোনো বাণিজ্যিক পণ্য না। মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার পূরণের দায়িত্ব স্বয়ং রাষ্ট্রের। অন্যদের মতো কখনোই বুর্জোয়া কিংবা কর্পোরেট পুঁজিবাদী রাজনৈতিক শক্তির কাছে নিজের আদর্শকে সমর্পণ করেননি। বিক্রি হোননি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের জাতীয় ঔষধনীতি প্রণয়ন, স্বাস্থ্যখাতের বাণিজ্যিকীকরণ বিরোধী অবস্থানে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা দেশের স্বাস্থ্যখাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ঔষধ শিল্পের বিকাশ ও দাম কমিয়ে গরিব মানুষের হাতের নাগালে নিয়ে আসার জন্য তার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এমনকি সীমিত সম্পদ দিয়ে কিভাবে স্বাস্থ্য চাহিদা মেটানো যায় সে চিন্তাও তাঁর ছিল। দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গক্রমে “তিনি আজীবন বলতেন ওষুধের দাম আরও কমানো সম্ভব”^[২৮] যা তিনি নিজে গণস্বাস্থ্যের অধীনে উচ্চমূল্যের ঔষধও সাধারণ মানুষের হাতে নাগালে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আশির দশকে তাঁর এই ঔষধনীতি বাস্তবায়নের বিরোধিতায় অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি তাঁর এক শুভানুধ্যায়ীকে বলেছিলেন ‘এরশাদকে দিয়ে যে ঔষধনীতি করিয়েছিলাম, তার বিরোধিতা করেছিলেন সিপিবি ও

আওয়ামী লীগ সমর্থক চিকিৎসকেরা এবং বিএমএ। তখন বিএমএর নেতৃত্বে ছিলেন ডা. সারওয়ার আলী, যিনি ছিলেন সিপিবি'র একজন বিশিষ্ট নেতা। সেদিন তিনি আরও বলেছিলেন, সারওয়ার ভাইয়েরা বিরোধিতা না করলে এরশাদের ঔষধনীতি হতো একটি যুগান্তকারী ঘটনা। [২৯] তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে কাজ করে প্রসঙ্গক্রমে একজন লিখেছেন:

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আছে ২২ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল। স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা করা হয়। এজন্য স্বাস্থ্য বীমার প্রবর্তন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বীমার ব্যাপারে গ্রামবাসীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যে পরিবার বছরের কোনো না কোনো সময়ে দু'বেলা পুরো খেতে পায় না তারা 'ক' দলভুক্ত। তারা ৫০ পয়সার বিনিময়ে সব ধরনের চিকিৎসা পেয়ে থাকেন। এ সঙ্গে পান উপদেশ, ঔষধ, রক্ত-কফ পরীক্ষা, এক্স-রে সবকিছুই। এদের কাছ থেকে একদম পয়সা না নেয়া সম্পর্কে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বক্তব্য হচ্ছে: 'ক' দলের লোকেরা ভূমিহীন। তারা যাতে কোনোক্রমেই বুঝতে না পারে যে তারা করুণার বস্ত্র, তাই কিছু না কিছু পয়সা নেয়া হয়। পয়সা না নিলে তা করুণার ব্যাপার হতে পারে এবং ভূমিহীনদের জন্য এটা অসম্মানজনক হতো। [৩০]

অর্থাৎ দেশের ঔষধনীতিই নয়, চিকিৎসার ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণেও তিনি ছিলেন ঘোর-বিরোধী। মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক সরঞ্জামে কর্পোরেট ব্যবসার মুনাফার থাবা থেকে রক্ষা করতে নিজ উদ্যোগে তৈরি করেছিলেন গণ-বিশ্ববিদ্যালয় নামক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। আয় পরিচালিত হয় প্রতিষ্ঠানের পেছনে। এখানে ধনী-গরিব সমস্ত শ্রেণি পেশার মানুষের সন্তানদের জন্য সমতা বিধান রক্ষা করা হয়। গ্রামীণ মেহনতি, শ্রমিক শ্রেণির সন্তানের জন্য থাকে বিশেষ সুবিধা। যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মুনাফা কেন্দ্রীক কার্যক্রম পরিচালিত করে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র ব্যতিক্রম। পাবলিক-প্রাইভেট ধারণা মিশ্রিত এ বিশ্ববিদ্যালয় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী'র সামাজিক মালিকানা রাষ্ট্র দর্শনের প্রতিভূ। তিনি উল্লেখ করেছেন:

জনগণকে তার জায়গাতেই রাখতে হবে। তার দোরগোড়াতাই তার জন্য স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে। অনেক সোজা কাজ আছে। সেসবই হাত দেওয়া হয় না। যেমন অ্যানেসথেসিয়া। গ্রামপর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে এর লোকবল নেই। এটা দেশের সর্বত্র তিন মাসের মধ্যে করা সম্ভব। আমাকে দিলে এক মাসেই করে দিতে পারব। গোটা স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ধুয়েমুছে সাজাতে হবে। রোগ যাই হোক, উন্নত চিকিৎসা দিতে সবাইকে তো ঢাকায় আনা যাবে না। আনা উচিতও হবে না [৩১]

বস্তুত, চিকিৎসাখাত ছাড়াও বাংলাদেশের কৃষকদের ধান বীজের জন্য পুরোপুরি বিভিন্ন কোম্পানির উপর এখন নির্ভর করতে হয়। বর্তমানে ১০০০ কোটি টাকার ধানবীজ বাজারের ১৮% নিয়ন্ত্রণ করে “সুপ্রিম সিড”। বাকিটা নিয়ন্ত্রণ করে বায়ার গ্রুপ, এসিআই, ব্র্যাক, ন্যাশনাল এগ্রিকেলার ইত্যাদি গ্রুপ। ‘সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএডিসি মাত্র ৬% বীজের যোগান দেয়। একইভাবে শাকসবজি বীজের ৩২% লাল তীর, ১৩% মেটাল, ১২% জামালপুর সিড নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ বীজের বাজার অল্প কয়েকটি কোম্পানির দখলে। সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএডিসিকে কার্যকর করে বীজ উৎপাদন, বিতরণে ব্যবস্থা করলে কৃষক অনেক লাভবান হতো। সারে ভর্তুকির বেশিরভাগ অর্থ আত্মসাৎ করে কোম্পানি। রাষ্ট্রীয় সার-কারখানাগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি না করে আমদানি নির্ভর হবার কারণে ক্রমাগত ইউরিয়াসহ অন্যান্য সারের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে কীটনাশকের বাজার রয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকার। এর মধ্যে দুইটি বহুজাতিক কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করছে প্রায় ৩ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বাজার। এই কীটনাশক বাজারের ৮২ দশমিক ৫ শতাংশ বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। [৩২] প্রধান ফসল ধানের মাত্র ১-২ শতাংশ সরকার সংগ্রহ করে। সেটাও সংগ্রহও করে মূলত মিল মালিক ও ব্যবসায়ী যেমন: প্রাণ-আরএফএল, এসিআই-এর মত বড় গ্রুপ থেকে। বাকি সম্পূর্ণ বাজারের নিয়ন্ত্রণ অল্প কিছু সিডিকেট ও ব্যবসায়ীদের হাতে। সিটি গ্রুপ, এরফান, রশিদ অটো রাইস মিল-এই কোম্পানিগুলো মূলত দেশের ধান-চালের বাজারের নিয়ন্ত্রক। একদা দেশে সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে গড়ে উঠছিল পোল্ট্রি শিল্প; যা ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার বাজারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু গত কয়েকবছরে এ শিল্পেও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সিডিকেটের ফলে ডিম, মাংস কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে খামারিরা। কাজী ফার্মস, নারিশ, প্যারাগন, আফতাব, কোয়ালিটি, প্রোভিটা, সিপি, ডায়মন্ড এগ-সহকিছু গ্রুপ মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন, খাদ্য, ঔষধ, ডিম ও মাংসের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। তারা উচ্চমূল্যে বাচ্চা, খাদ্য ও ঔষধ বিক্রি করছে আবার কম দামে ডিম ও মুরগী কিনছে। ফলে ছোট খামারিরা লোকসান করে খামার বন্ধ করে দিচ্ছে অথবা এসকল কর্পোরেট কোম্পানির “কন্ট্রাস্ট ফার্মার” হতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে ভোগপণ্য প্রোটিন প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ টন দুধ উৎপাদিত হয় যা মোট চাহিদার প্রায় ৮০ ভাগ। মাংসের উৎপাদন প্রায় ৯৭ লক্ষ টন, যা মোট চাহিদার তুলনায় বেশি। এত ভালো উৎপাদনের পরও চাষীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তার প্রধান

কারণ পশুখাদ্য ও ঔষধের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। প্রাণী খাদ্যের বাজারও উপরোক্ত কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত বাজার দখল করতে আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন সংস্থা বিশেষত আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল), বিশ্বব্যাংক, এডিবি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক) ও সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকা, ভারত, চীন বিভিন্নসময় কৃষিক্ষেত্রে নানা নীতি প্রণয়নে চাপ প্রয়োগ করে আসছে। বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজীসহ সকল পাট ও চিনিকল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এরফলে কৃষক যারা পাট ও আখ উৎপাদন করতো তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়েছে। অর্থনীতিতে আগের তুলনায় আমদানি নির্ভরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্পোরেট পুঁজির এই দৌরাভ্যে জাফরুল্লাহ চৌধুরী গ্রামকে বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে দেখতেন। তাঁর “গ্রাম মডেল” ধারণার কেন্দ্রে ছিল স্বনির্ভর গ্রাম, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান ও স্থানীয় গণতন্ত্র একই কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হবে। তিনি মনে করতেন গ্রামের মানুষকে উন্নয়নের ভোক্তা নয়, অংশীদার ও মালিক হতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও কৃষি সহায়তা গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে হবে। ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষের জন্য জমি, উৎপাদন ও সম্পদের ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করতে হবে। কারণ খুচরা পাইকারি ব্যবসায় পুঁজিবাদ আসলে বড় পুঁজির নিয়ন্ত্রণের একটি অংশ, যেখানে ছোট ব্যবসায়ী টিকে থাকতে পারে না এবং বাজার একচেটিয়া হয়ে যায়। বড় পুঁজির আধিপত্যের বিরোধিতায় তিনি মনে করতেন, কয়েকটি বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত হলে বৈষম্য বাড়ে এবং গণতন্ত্র দুর্বল হয় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ ও ব্যক্তিমালিকানার মধ্যবর্তী একটি পথ হিসেবে তিনি সমবায়, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দিতেন। যেখানে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে অতিরিক্ত মুনাফাভোগী স্তর কমানোর পক্ষে ছিলেন তিনি। গণ-ট্রাস্ট এর প্রজেক্টগুলো তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। তিনি যদিও সোভিয়েত বা চীনা ধাঁচের কেন্দ্রীভূত অর্থনীতির প্রবক্তা নন; তারপরও বাংলাদেশের বাজারের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিতে তার ওপর সামাজিক ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর রাষ্ট্র-দর্শনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের এ-সকল সমস্যা বিবেচনায় সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে রাষ্ট্র সংস্কারে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর পাঁচটি প্রস্তাবনা ছিল অত্যন্ত যুগোপযোগী। তাঁর প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ:

১. (ক) স্থানীয় সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচের সর্বোচ্চ দ্বিগুণ মূল্য স্থির হবে বিক্রয়মূল্য হিসেবে এবং নগরবাসী কৃষিপণ্য পাবেন উৎপাদক সমবায় সমিতির নির্ধারিত মূল্যের সর্বোচ্চ ২-৩ গুণ বেশি মূল্যে। অর্থাৎ কৃষকের ১ কেজি পণ্যের স্থানীয় বিক্রয় দর ৫ টাকা হলে নগরবাসী তা পাবেন ১০-১৫ টাকায়। (খ) প্রয়োজন মার্কিন সব কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ভর্তুকি দেওয়া হবে, যেন কৃষিতে কর্মসংস্থান বাড়ে এবং ভারত ও পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে কৃষিজাত পণ্যের আমদানি কমে। ২. বাজারমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ হবে এবং সামরিক বাহিনীর দরে সব শ্রমিককে রেশন দেওয়া হবে। শ্রমিকরা মাসিক মাত্র ২৫০ টাকা প্রিমিয়ামে সব স্বাস্থ্য সুরক্ষা বীমা সুবিধা পাবেন। শ্রমিকরা কেবল ওষুধের মূল্য দেবেন। ৩. (ক) সারাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দ্রুত উন্নয়নের নিমিত্তে ‘১৯৮২ সালের জাতীয় ঔষুধনীতির’ সুষ্ঠু প্রয়োগ হলে তিন মাসের মধ্যে সব অত্যাধিকারী ওষুধের মূল্য ন্যূনতম অর্ধেক হবে এবং এসব ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার দর কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কমে আসবে। হৃদরোগের চিকিৎসা খরচও একই হারে কমে। প্রাথমিক অবস্থায় টাকা শহরে নতুন কোনো হৃদরোগের সরকারি হাসপাতাল তৈরি না করে ৮টি প্রধান শহরে হৃদরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। (খ) গ্রামীণ জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সব ইন্টার্ন চিকিৎসককে এক বছর ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করে এক বছর প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হবে। (গ) সব বড় ও জেলা শহরে জেনারেল প্র্যাকটিশনার্সপ্রথা চিকিৎসা সৃষ্টি করে দ্রুত যথাযথ চিকিৎসার জন্য রেফারেল ব্যবস্থা শুরু হবে। (ঘ) আইনের সংশোধন করে অঙ্গ প্রতিস্থাপন নিয়মাবলি সহজলভ্য করা হবে। বাংলাদেশের সর্বত্র ৬ মাসের মধ্যে কিডনি প্রতিস্থাপন হবে দেড় লাখ থেকে দুই লাখ টাকায়। ৪. (ক) দুই বছরের মধ্যে ৫ লাখ গ্রাজুয়েটের কর্মসংস্থান হবে। (খ) সব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের তিন মাস বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেওয়া হবে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে। (গ) বয়োবৃদ্ধরা অর্ধেক মূল্যে বাস ও ট্রেনে ভ্রমণ সুবিধা পাবেন এবং শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধদের জন্য অবৈতনিক কর্মসংস্থান হবে। ৫. (ক) মুখে রক্ত সঞ্চারণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, বরং মৃত্যুর ঘণ্টা। ঢাকা শহরে আর একটিও সরকারি বিস্তিং, এমনকি সরকারি হাসপাতালও নয়। দুই বছরের মধ্যে প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও টেক্সটাইল বই প্রকাশনা, গণপরিবহন, নারী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা ৮টি প্রদেশ বা ১৭টি স্টেটভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে সুপ্রিমকোর্ট, সেনাবাহিনী, পররাষ্ট্র, বৈদেশিক বাণিজ্য, বিমান ও সমুদ্রবন্দর, আন্তঃজেলা মহাসড়ক এবং ইনকাম ট্যাক্স ও শুল্ক ব্যবস্থাপনা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর এবং নৌ ও বন্দর মন্ত্রণালয় চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হবে। (খ) আইন ও বিচার বিভাগের সংস্কার, বিচারকদের স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি ও বিচারকাজে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। হাইকোর্টের বিচারপতিদের বার্ষিক ছুটি ৪ সপ্তাহে সীমিতকরণ এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে মামলার রায় চূড়ান্ত করা হবে। সব সিভিল ও ক্রিমিনাল মানহানি মামলায় বাধ্যতামূলক কোর্ট ফি নির্ধারণ, পুলিশ বা অন্যভাবে সৃষ্ট মিথ্যা মামলার জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা এবং কেবল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাসস্থানের শহর-আদালতে মানহানির মামলা করতে হবে, অন্যত্র নয়। অহেতুক মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ মানহানির মামলা করতে পারবেন না (গ) আইনের অপপ্রয়োগ নয়, সঠিক প্রয়োগই লক্ষ্য। খুনের মামলা ছাড়া অন্য মামলার আসামিদের হাইকোর্টে জামিন হলে সরকার সুপ্রিমকোর্টে আপিল করে অহেতুক সময় ও অর্থ ব্যয় করবে না। (ঘ) সংবিধানের সংস্কার করা হবে, গণভোট, ন্যায়পাল নিয়োগ হবে। আলাদা সাংবিধানিক কোর্ট স্থাপন করা হবে প্রত্যেক প্রদেশ বা স্টেটে। সুপ্রিমকোর্ট বসবে কেন্দ্রীয় রাজধানীতে [৩৩]

অর্থাৎ, বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠন সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবনাগুলো সমন্বয়বাদী ও সংস্কারমুখী। যার দার্শনিক ভিত্তি সমাজতন্ত্র কিন্তু ক্লাসিক্যাল মার্কসীজম নয়; বরং এগুলো পাশ্চাত্য উদারনৈতিক, মার্কসবাদ ও দেশীয় মূল্যবোধের আবহে মিশ্রিত সামাজিক মালিকানার রাষ্ট্রতত্ত্ব। ব্যক্তিগত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেও শ্রেণিহীন থেকেছেন; প্রতিষ্ঠিত ‘প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানার উদাহরণ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। জনগণকে সম্পৃক্ত করেছেন।’^[৩৪] মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও এক বক্তৃতায় জনগণ ও তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ‘রাস্তায় নেমে আসেন। কল্যাণকর রাষ্ট্রের জন্য সবাইকে একত্রিত হয়ে সংগ্রাম করতে হবে। সেই সংগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছি। যতই বয়স হোক, হুইল চেয়ারে বসে থাকলেও আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব।’^[৩৫] আমৃত্যু তিনি ছিলেনও তাই। তাঁর ফাঁসি চেয়ে ঢাকায় পোস্টারিং করা, চুরির অপবাদে মামলা, হয়রানি করে তাঁকে দমানো যায়নি। তাঁর বিশ্বাস তরুণরা পুরনো বন্দোবস্ত পরিবর্তনে সামাজিক মালিকানা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে নেতৃত্ব দিবে সৃজনশীল চর্চায়। ভেঙে ফেলবে শোষণের যন্ত্র। মানবিক হবে সমাজ। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হবে জনবান্ধব ও কল্যাণকর “সামাজিক মালিকানার”।

উপসংহার

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সামাজিক মালিকানাভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তা বাংলাদেশে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ অধ্যুষিত বুর্জোয়া শাসনকাঠামোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একটি মানবকেন্দ্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক বিকল্প দর্শন হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রাষ্ট্রভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা; যেখানে উৎপাদিত সামাজিক সম্পদে যোগ্যতার সুযোগ, ন্যায্যতা এবং ক্ষমতার ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত হবে। সাধারণ জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রকৃত অংশীদার হবে। তিনি রাষ্ট্রকে কেবল ভোটের মাঠে বিজয়ী শাসক আর শাসনব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক কাঠামো হিসেবে দেখেন নি; তাঁর এ চিন্তায় সামাজিক মালিকানায় রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং জনগণের অংশগ্রহণমূলক মালিকানা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাই আসল। তিনি বিশ্বাস করতেন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে প্রকৃত গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়ন, উদার বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক বৈষম্যের যুগে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সামাজিক মালিকানার রাষ্ট্রচিন্তা কেবল একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয়; বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও কল্যাণমুখী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র নির্মাণের বাস্তব দিকনির্দেশনা হিসেবেও মূল্যায়িত হতে পারে।

লেখকের অবদান

গবেষণার ধারণা ও কাঠামো প্রণয়নে মুক্তিযোদ্ধা, চিকিৎসক ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জীবনকর্ম, বক্তব্য, চিন্তাধারা, সভা-সেমিনারে তাঁর আলোচনা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, রাষ্ট্র সংস্কার বিষয়ে চিন্তাদর্শনের প্রভাব রয়েছে। প্রফেসর ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মূল গবেষণার ভাবনা, শিরোনাম নির্বাচন, প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনায় তার উপর গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করতে গবেষককে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যুক্তি ও ব্যাখ্যা সমৃদ্ধকরণ, ভাষাগত পরিমার্জন এবং প্রবন্ধের চূড়ান্ত সম্পাদনা সম্পন্ন করেছেন গবেষক নিজেই। প্রবন্ধের চূড়ান্ত সংস্করণ গবেষক মনোযোগ সহকারে পাঠ ও অনুমোদন করেছেন এবং এর বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের যথার্থতার জন্য গবেষক নিজেই দায়বদ্ধ থাকবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কার্য সম্পাদনের সমগ্র প্রক্রিয়ায় যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাঁরে প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিকুর রহমান স্যারকে। যিনি গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। একই সাথে বাংলা বিভাগ সেমিনার লাইব্রেরি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সম্মানিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে, যাদের একাডেমিক কাজে সহায়তা, গবেষণামুখী পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এই গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি রংপুর বিভাগীয় গণ-গ্রন্থাগার ও দেশের বস্তুনিষ্ঠ মূলধারার গণ-মাধ্যমগুলোর প্রতি; যাদের সম্পাদিত লেখাপত্র থেকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিল ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আমি গবেষণায় সংযুক্ত করতে পেরেছি।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব

এই গবেষণা প্রবন্ধ “ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী: সামাজিক মালিকানার রাষ্ট্রচিন্তা” এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ধরনের আর্থিক, সামাজিক সংগঠন; পেশাগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থে কোনোরকম দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ অনুপস্থিত। তবে রাষ্ট্র কাঠামোগত পরিবর্তনে অবিশ্বাসী; এমন সব দল, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারে বিশ্বাসী, পুরনো বন্দোবস্ত ও সিস্টেম পরিবর্তনে আস্থাবান, প্রগতিশীল ও সামাজিক মালিকানার রাষ্ট্র সংগ্রামে নিয়োজিত সেরা তরুণ-তরুণী, মানুষের দল বা সংগঠনের সাথে দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত।

তথ্যসূত্র

১. প্রথম আলো। (২০১৬, ১৭ এপ্রিল)। “বিশেষ সাক্ষাৎকার: জাফরুল্লাহ চৌধুরী।”, ঢাকা।
২. মেজবাহ কামাল (সম্পা.)। (২০২৪)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা (পৃ. ২১৩)। সৌম্য প্রকাশনী, ঢাকা।
৩. বাংলা নিউজ২৪। (২০২৩, ১২ এপ্রিল)। “ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর আলোচিত ১০ উক্তি।” বাংলা নিউজ২৪, ঢাকা।
৪. নজরুল ইসলাম। (২০২৬, ২০ মে)। মাওলানা ভাসানী পরিষদের সদস্য নজরুল ইসলামের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার [ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার]। ঢাকা।
৫. প্রথম আলো। (২০২৫, ৭ জানুয়ারি)। “জাফরুল্লাহ শুধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নয়, মানুষের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।” প্রথম আলো, ঢাকা।
৬. মেজবাহ কামাল (সম্পা.)। (২০২৪)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা (পৃ. ৫০)। সৌম্য প্রকাশনী, ঢাকা।
৭. মেজবাহ কামাল (সম্পা.)। (২০২৪)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা (পৃ. ৩০৫-৩০৬)। সৌম্য প্রকাশনী, ঢাকা।
৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। (২০১৭)। পুঁজিবাদের দুঃশাসন (পৃ. ১৪৮-১৪৯)। রোদেলা, ঢাকা।
৯. মাওলানা ভাসানী। (২০২০)। মাও সে-তুঙের দেশে (পৃ. ৩০)। সংহতি প্রকাশন, ঢাকা।
১০. বদরুদ্দীন উমর। (২০০৩)। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র (পৃ. ১৯৪)। সাহিত্যিকা, ঢাকা।
১১. ইকবাল কবীর (সম্পা.)। (২০১৬)। ছাত্রকণ্ঠ (পৃ. ৯)। ঢাকা।
১২. আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া (অনু.)। (১৯৮৮)। ফ্রাঞ্জ ফেনো: জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত (পৃ. ৪৫)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
১৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। (২০০৫)। বাম সংকীর্ণতার বিভ্রান্তি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (পৃ. ৫-৬)। মুক্তিভবন, ঢাকা।
১৪. আ. ব. ম. মোস্তাফা আমীন। (১৯৯০)। রাজনীতি সমাজ স্বৈরাচার বাংলাদেশ (পৃ. ১২৫)। মুহুরী পাবলিশার্স, ঢাকা।
১৫. জাগো নিউজ। (২০২১, ৩১ মে)। “মোদির আগমনের প্রতিবাদ করে ছাত্রা ন্যায্য কাজ করেছে: জাফরুল্লাহ।” জাগো নিউজ, ঢাকা।
১৬. সাম্প্রতিক দেশকাল। (২০২১, ৫ জুলাই)। “আমাদের পরিবর্তন দরকার: ডা. জাফরুল্লাহ।”, ঢাকা।
১৭. নূরুল আনোয়ার (সম্পা.)। (২০১৩)। আহমদ হুফা রচনাবলি ৫ (পৃ. ২৪২)। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।
১৮. খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (সম্পা.)। (২০০৪)। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ৩ (পৃ. ২১-২২)। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
১৯. প্রথম আলো। (২০১৬, ১৭ এপ্রিল)। “বিশেষ সাক্ষাৎকার: জাফরুল্লাহ চৌধুরী।” প্রথম আলো, ঢাকা।
২০. আনু মুহাম্মদ। (২০০০)। রাষ্ট্র ও রাজনীতি: বাংলাদেশের দুই দশক (পৃ. ৭৭)। সন্দেশ, ঢাকা।
২১. বদরুদ্দীন উমর। (২০১৫)। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা (পৃ. ৭০-৭২)। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
২২. আহমদ শরীফ। (২০০০)। বিশ্বাসবাদ-বিজ্ঞানবাদ-যুক্তিবাদ-মৌলবাদ (পৃ. ৬৮)। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২৩. আবুল বারকাত। (২০১৭)। অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য (পৃ. ১৭৯-১৮০)। মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা।

২৪. প্রথম আলো। (২০২২, ৫ জুন)। “স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি না হলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমবে না।” প্রথম আলো, ঢাকা।
২৫. আহমদ শরীফ। (১৯৯১)। গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাভাব্য ও বিচিত্রভাবনা (পৃ. ৩৫)। আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।
২৬. প্রথম আলো। (২০১৬, ১৭ এপ্রিল)। “বিশেষ সাক্ষাৎকার: আমি শেখ হাসিনারও শুভানুধ্যায়ী: জাফরুল্লাহ চৌধুরী।”, ঢাকা।
২৭. দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। (২০২৩, ১২ এপ্রিল)। “গণস্বাস্থ্য এবং জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সফল ইউটোপিয়া।”, ঢাকা।
২৮. দ্য ডেইলি স্টার বাংলা। (২০২৫, ২৭ ডিসেম্বর)। “ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী: চলমান এক আদর্শ।”, ঢাকা।
২৯. ইত্তেফাক। (২০২৩, ১৩ এপ্রিল)। “জাফরুল্লাহ চৌধুরী: অসাধারণ মানুষ।”, ঢাকা।
৩০. দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। (২০২৩, ১২ এপ্রিল)। “গণস্বাস্থ্য এবং জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সফল ইউটোপিয়া।”, ঢাকা।
৩১. প্রথম আলো। (২০২০, ১২ মার্চ)। “কিটের ফর্মুলা উন্মুক্ত করতে রাজি আছি: জাফরুল্লাহ চৌধুরী।” প্রথম আলো, ঢাকা।
৩২. বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন। (২০২৬)। কৃষিতে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কালো থাবা (পৃ. ১৪-১৭)। ঢাকা।
৩৩. যমুনা টিভি। (২০১৮, ১৬ নভেম্বর)। “ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর ৫ প্রস্তাব।”, ঢাকা।
৩৪. প্রথম আলো। (২০২৫, ৭ জানুয়ারি)। “জাফরুল্লাহ শুধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নয়, মানুষের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।”
৩৫. বাংলা নিউজ২৪। (২০২৩, ১২ এপ্রিল)। “ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর আলোচিত ১০ উক্তি।” ঢাকা।